কলা অনুষদ পত্রিকা, খণ্ড : ১৪, সংখ্যা : ১৯, জুলাই ২০২৩- জুন ২০২৪
DOI:

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহশিক্ষা কার্যক্রম এবং শিক্ষার্থীদের জীবনে এর প্রভাব

মো. আবদুর রহিম*

Abstract : The University of Dhaka is the oldest institution of higher learning in Bangladesh. Following the annulment of the Partition of Bengal in 1911, the British Government undertook the initiative to establish a university in Dhaka. The institution formally established in 1921 with the primary objective of advancing the educationally and socially disadvantaged communities of Eastern Bengal. Its establishment marked a significant turning point in the intellectual and cultural development of the region.

Prior to the founding of the University of Dhaka, modern Western education had already been introduced in the Indian subcontinent through the establishment of universities in Calcutta, Madras, and Bombay. Nevertheless, the University of Dhaka differed from these earlier institutions in both structure and vision. Conceived as a unitary, residential, and teaching university, it integrated a wide range of co-curricular activities alongside its formal academic curricula. From almost the very beginning of the establishment of the University of Dhaka, institutions such as the Hall Students' Union—later the Central Students' Union—the Physical Education Centre, and the teacher- students' Centre were founded to encourage students' co-curricular and socio-cultural activities. At present, the scope of co-curricular activities has expanded even further. Such activities contribute to a more holistic and enriching educational environment. The overall environment of the university has played a significant role in shaping the psychological transformation of students coming from rural areas.

For generations, Dhaka University accelerated this transformation, exerting profound influence on the social, cultural, and political spheres of Eastern Bengal and contributing significantly to the emergence of independent Bangladesh. The university has played a central role in all major national achievements, and its distinctive academic and socio-cultural milieu has nurtured successive generations of graduates with notable leadership qualities over the past century.

This article seeks to examine the co-curricular activities of the University of Dhaka and to assess their influence on the formation of its graduates. It further explores how the university's educational philosophy has shaped and transformed the intellectual outlook of the inhabitants of this region.

* অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ভূমিকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের একটি মডেল বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এখানে নিয়মিত পাঠ্যসূচির সাথে সহশিক্ষা এবং পাঠ্যবহির্ভূত কার্যক্রম শিক্ষার্থীদের মধ্যে মৌলিক চিন্তা বিকাশের সুযোগ তৈরি করে। এই ক্যাম্পাসের পারিপার্শ্বিক পরিবেশের প্রভাবে স্বাভাবিক কারণেই শিক্ষার্থীরা ক্লাস এবং গবেষণাগারের পাশাপাশি নতুন নতুন সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং স্বেচ্ছাশ্রম ও সমাজসেবামূলক কাজের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে। সময়ের আবর্তে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পাঠ্যক্রমবহির্ভূত সহশিক্ষামূলক অনেক কাজ প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছে। এছাড়া এখানে বিভিন্ন মতাদর্শের ছাত্রসংগঠনের কার্যক্রম পরিচালনার অধিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি দ্বারা স্বীকৃত। শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক-সাংস্কৃতিক তথা সেবামূলক কাজের মাধ্যমে এই ক্যাম্পাস সর্বদা ক্রিয়াশীল থেকেছে। বিশেষ করে ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র, মধুর ক্যান্টিন, আবাসিক হল, ঐতিহাসিক বটতলা, পুরাতন কলাভবনের আমতলা, অপরাজেয় বাংলা, অধুনা প্রতিষ্ঠিত রাজু চত্বর, স্বোপার্জিত স্বাধীনতা, চারুকলা অনুষদ, বকুলতলা ইত্যাদি স্থানে শিক্ষার্থীরা ঘরোয়া ও বহিরাঙ্গনের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও বিভিন্ন ধরনের সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন। ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের (টিএসসি) বারান্দায় এবং বিভিন্ন অ্যাকাডেমিক ভবনের সম্মুখস্থ খোলা প্রাঙ্গণে বিভিন্ন ধরনের সংগঠনের প্রচার কার্যক্রম, পথনাটক বা সঙ্গীত চর্চা, দুর্যোগ-দুর্বিপাকে দুর্গত মানুষ বা অসুস্থদের চিকিৎসা সহায়তার আর্থিক অনুদান সংগ্রহ, রক্তের গ্রুপ নির্ণয় কিংবা রক্তদান থেকে শুরু করে ছাত্র সংগঠনসমূহের সাংগঠনিক কার্যক্রমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস সদা কর্মমুখর থাকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত এ ধরনের কার্যক্রম একদিকে নেতৃত্বের গুণাবলিসম্পন্ন দক্ষ নাগরিক সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে, অন্যদিকে তা জাতীয় প্রয়োজনে সমাজের জন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। বর্তমান প্রবন্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাসরুম-শিক্ষার বাইরে সহশিক্ষামূলক কাজের চর্চা এবং ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে তার প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

গবেষণা পদ্ধতি

গবেষণাটি পরিচালনার ক্ষেত্রে গুণগত ও ঐতিহাসিক তথ্য বিশ্লেষণ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। প্রাথমিক ও দ্বৈতীয়িক উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯১২ সালে গঠিত 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি', ১৯১৭ সালে গঠিত 'কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন'-এর রিপোর্ট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ ১৯২০ (Act No.XVIII of 1920), 'ইন্ডিয়ান স্ট্যাটুটারি কমিশন রিপোর্ট' ১৯২৯, 'সিন্ডিকেট মিটিং মাইনটস', রেজিস্ট্রার দপ্তরের বিভিন্ন নথি, পত্রাবলি প্রভৃতি প্রাথমিক তথ্যের উৎস। এছাড়া দ্বৈতীয়িক উৎস যেমন জার্নাল, বই, স্মৃতিকথা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক বাজেট, বার্ষিক বিবরণী, হল বার্ষিক, সংবাদ-সাময়িকপত্র, টিএসসি এবং ছাত্রনির্দেশনা ও পরামর্শ দপ্তরের প্রকাশনা এবং প্রচারপত্র, বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক ক্লাব, সংগঠন যেমন– বাঁধন, ডিবেটিং সোসাইটি, কুইজ সোসাইট প্রভৃতি সংগঠনের বার্ষিক রিপোর্ট এবং স্মরণিকা থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহশালা, বিভাগের সেমিনার লাইব্রেরি, হল লাইব্রেরি, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি গ্রন্থাগার, শারীরিক শিক্ষাকেন্দ্রে সংরক্ষিত গ্রন্থ, রিপোর্ট, নথিপত্র, জার্নাল ও সংশ্লিষ্ট দলিল-দস্তাবেজ পর্যালোচনা করা হয়েছে।

গবেষণার যৌক্তিকতা

ঢাকা বিশ্ববিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য ছিল পূর্ববাংলার পশ্চাৎপদ কৃষিভিত্তিক অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর আত্মজাগরণ। প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থীদের জীবন-দর্শন, মানসিকতা, ও সামগ্রিক ব্যক্তিত্ব গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য অনুযায়ী আধুনিক পশ্চিমা শিক্ষার সাথে প্রাচ্যের চিন্তাদর্শনের সমন্বয় ঘটেছিল এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থায়। এর ফলে এটি অতি দ্রুতই আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার সাথে সাথে বাঙালি সংস্কৃতির লালন কেন্দ্রে পরিণত হয়– যা গ্রাম থেকে আগত শিক্ষার্থীসহ সমাজের নানা স্তরের মানুষের মধ্যে অসাম্প্রদায়িক মানবিক চিন্তার উন্মেষ ঘটায়।

ঢাকার নগর সংস্কৃতি, বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক পরিবেশ, সহশিক্ষামূলক কার্যক্রম এবং সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল শিক্ষার্থীর মানসিক বিকাশ, দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন এবং ভবিষ্যৎ জীবন পরিকল্পনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বিশেষত গ্রামীণ পটভূমি থেকে আগত শিক্ষার্থীরা যখন আধুনিকত নগর সভ্যতা, সাংস্কৃতিক বহুমাত্রিকতা ও গণতান্ত্রিক চর্চার সাথে পরিচিত হয়, তখন তাদের চিন্তা-চেতনা ও মনস্তত্ত্বে যে রূপান্তর ঘটায়- তা সমাজবিজ্ঞান তথা শিক্ষা গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরিণত হয়।

বাংলাদেশের প্রগতিশীল শিক্ষাচর্চা, বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বরাবরই কেন্দ্রীয় ভূমিকায় অবস্থিত। স্বাধীনতা সংগ্রামসহ রাষ্ট্রীয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিকসহ সকল গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় অর্জনে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান অনস্বীকার্য। এর সহশিক্ষামূলক কার্যক্রম, ছাত্র-শিক্ষক মিথস্ক্রিয়া এবং সাংস্কৃতিক অনুষঙ্গ শিক্ষার্থীদের চরিত্র গঠন, নেতৃত্বের বিকাশ, মানবিক ভাবনা ও মূল্যবোধ নির্মাণে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

এ গবেষণার কেন্দ্রীয় প্রশ্ন হলো- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহশিক্ষামূলক ও সচেতনতা-বর্ধক কার্যক্রম কীভাবে শিক্ষার্থীদের চিন্তাচেতনা, মননশীলতা ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটিয়েছে? পাশাপাশি, কোন কোন উপাদান এই রূপান্তর প্রক্রিয়ায় সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে? বর্তমান গবেষণায় এসব প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদর্শন ও সহশিক্ষামূলক পরিবেশের প্রভাব বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

গবেষণার সীমাবদ্ধতা

নির্বাচিত বিষয়টি গবেষণার ক্ষেত্রে কিছু সীমাবদ্ধতা রয়ে গেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকালীন প্রাথমিক অনেক নথিপত্রই বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার বা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহশালায় পাওয়া যায় না। সচেতনতার অভাব, মুক্তিযুদ্ধকালীন দুর্যোগময় পরিস্থিতি ইত্যাদি কারণে অনেক নথিপত্রই হারিয়ে গেছে। প্রাথমিক অল্প-বিস্তর কিছু নথিপত্র রয়েছে যা থেকে তথ্য সংগ্রহ করা কষ্টসাধ্য, অনেক ক্ষেত্রে দুরূহও বটে। সে ক্ষেত্রে দ্বৈতীয়িক উৎস এবং স্মৃতিকথার ওপর অনেকটাই নির্ভর করতে হয়। ইতিহাস গবেষণায় দ্বৈতীয়িক উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ স্বীকৃত পদ্ধতি হলেও অনেক ক্ষেত্রে তথ্যগত ভুলভ্রান্তির সম্ভাবনা থেকেই যায়। সে ক্ষেত্রে একাধিক উৎস থেকে তথ্য নিয়ে যাচাই-বাছাইয়ের চেষ্টা করা হয়েছে। এতদসত্ত্বেও কিছু তথ্যগত বিভ্রাট থেকে যাওয়া অমূলক নয়। এছাড়া বক্ষমান গবেষণাটি একটি বৃহৎ ক্ষেত্র। প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে এর দৈর্ঘ্য সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা থাকে। সে ক্ষেত্রে কিছুটা সংক্ষিপ্ত পরিসরে গবেষণা প্রবন্ধটি উপস্থাপিত হয়েছে। আরও বড় পরিসরে গবেষণাটি পরিচালনার যথেষ্ট সুযোগ রয়ে গেছে। প্রাক্তন যে সকল শিক্ষার্থী সহশিক্ষামূলক শিক্ষাকার্যক্রমে যুক্ত ছিলেন এবং

যারা ছিলেন না পেশাগত জীবনে তাঁদের তুলনামূলক কাজের দক্ষতা ও নেতৃত্ব প্রদানের সক্ষমতা সম্পর্কে একটি জরিপ করতে পারলে গবেষণাটি আরও সমৃদ্ধ হতো। প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের স্মৃতিকথা থেকে সে ঘাটতি খানিকটা পূরণ হলেও তা যথেষ্ট নয়। এ সকল সীমাদ্ধতা সত্ত্বেও এই গবেষণাটি ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে এ সংক্রান্ত কার্যক্রমের প্রভাব নির্ণয় এবং সহশিক্ষামূলক কার্যক্রমের ঘাটতিসমূহ চিহ্নিতকরণে সহায়ক হবে। অন্যদিকে আগ্রহী পাঠক ও গবেষকদের জন্য বৃহত্তর পর্যায়ে এ ধরনের গবেষণার পথ উন্মুক্ত করবে।

সহশিক্ষামূলক কার্যক্রম

সহশিক্ষমূলক কার্যক্রম বলতে সেইসব কার্যক্রমকে বুঝায় যা মূলত পাঠ্যক্রমের বাইরের কার্যক্রম তবে শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দক্ষতা, মানসিক বিকাশ ও সামাজিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এগুলো শ্রেণিকক্ষের শিক্ষার সহায়ক আবার কখনো কখনো পরিপূরক। এসব কার্যক্রম মূলত নেতৃত্বের গুণাবলি, দলগত কাজে অংশগ্রহণের মানসিকতা অর্জন, সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধ গঠন, যোগাযোগ-দক্ষতা বৃদ্ধি, মানসিক ও শারীরিক বিকাশ এবং পরিশেষে অর্জিত জ্ঞানের প্রায়োগিক কৌশল নির্ধারণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। শ্রেণিকক্ষের তাত্ত্বিক জ্ঞানের সাথে সহশিক্ষকমূলক কার্যক্রমের প্রায়োগিক প্রশিক্ষণ একজন শিক্ষার্থীকে কর্মক্ষম নাগরিকে রূপান্তর করতে পারে। এ বাস্তবতা থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই ক্লাসরুম শিক্ষার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের জন্য সহশিক্ষা কার্যক্রমের ব্যবস্থা করে, যা ঢাকায় নতুন প্রাণ সঞ্চার করে। বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত বক্তৃতা, সাহিত্য প্রতিযোগিতা, বিতর্ক অনুষ্ঠান এবং আবাসিক হলগুলোতে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম বিশ্ববিদ্যালয়ে এক প্রাণময় মাত্রা যোগ করে (Rahim, 1981: 172-73)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ের মডেল অনুসরণ করা হয়েছিল সেসবের অন্যতম অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে শিক্ষার্থীদের দ্বারা ৪০০টিরও বেশি বিভিন্ন ধরনের ক্লাব কার্যক্রম পরিচালিত হয়[১]। এসবের মধ্যে ২০০টির বেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত। অনুরূপভাবে পৃথিবীর আরেকটি অন্যতম প্রাচীন বিদ্যায়তন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়সহ পৃথিবীর স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালসমূহে সহশিক্ষামূলক কার্যক্রমকে গুরুত্ব প্রদান করা হয়ে থাকে। বর্তমান প্রবন্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক সংগঠন, স্বেচ্ছাসেবামূলক এবং পরিবেশ সংক্রান্ত ক্লাব বা সোসাইটির কার্যক্রম এবং আরও যে সব সহশিক্ষামূলক কার্যক্রম পরিচালিত হয় সেসব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্পে পাঠ্যবহির্ভূত শিক্ষাভাবনা

ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম কলকাতা, মুম্বাই, ও মাদ্রাজে ১৯৫৮ সালে ব্রিটিশরা আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে। যার মাধ্যমে উপমহাদেশে পাশ্চাত্য ধাঁচের আধুনিক উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা সেসকল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কিছুটা ভিন্ন ছিল। ব্রিটিশ সরকার ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে পাঠদান ও আবাসিক (teaching and residential) বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়ে প্রায় একদশক ধরে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে অনেক আলোচনা-পর্যালোচনা করা হয়েছিল। ক্যাম্পাসকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা ছাত্রদের জন্য যেন আকর্ষণীয় ও সুখকর হয় তার জন্য নাথান কমিটির রিপোর্টে কিছু সহশিক্ষামূলক কার্যক্রমের সুপারিশ করা হয়েছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনও নাথান কমিটির সেসকল সুপারিশ গ্রহণ করেছিল। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই আবাসিক ও সংযুক্ত শিক্ষার্থীদের সুস্থদেহ এবং পূর্ণাঙ্গ মানসিক বিকাশের জন্য সাহিত্য ও নাট্যচর্চা, এবং খেলাধুলা,

সমাজসেবা ইত্যাদি পাঠ্যসূচি বহির্ভূত কার্যক্রমের ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল (রংগলাল, ২০০৩: ৩৪)

কাজেই দেখা যাচ্ছে এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার চিন্তাদর্শনেই সহশিক্ষার বীজ উপ্ত ছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবনায় পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন আবাসিক শিক্ষার্থীদের শিক্ষাকার্যক্রম ও 'কর্পোরেট জীবন' যেন আনন্দময় হয় সেই চিন্তা এবং তারই অনুষঙ্গ হিসেবে বিভিন্ন ধরনের পাঠ্যবহির্ভূত কর্মসূচি রাখা হয়। উল্লেখ্য যে, এখানে ছাত্র-শিক্ষক সকলকেই নির্দিষ্ট হলে সংযুক্ত থাকতে হয়। কমিশন ভারতবর্ষের প্রায় সকল উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেন এবং পশ্চিমা কয়েকটি খ্যাতিমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো পর্যালোচনা করেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ধাঁচে এ বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠে । প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতির চেয়ে আরেকটু ভিন্ন আঙ্গিকে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব করে যা ভারতে বিদ্যমান বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ থেকে আলাদা হবে। তা ছিল সহশিক্ষা এবং পাঠ্যক্রম বহির্ভূত শিক্ষার সমন্বয়ে বাস্তবমুখী এবং আবাসিক শিক্ষাপদ্ধতি। আবাসিক শিক্ষাপদ্ধতি আচার-আচরণ এবং শিষ্টাচার শেখার সুযোগ তৈরি করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাবনায় শিক্ষার্থীদের থাকার জন্য কলেজের মর্যাদা ও প্রশাসনিক ক্ষমতাসম্পন্ন হল এবং প্রতিটি হলে একটি করে হল ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেছিল। কমিশনের রিপোর্টে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয় –

> We warmly endorse the proposal for the foundation of a university union on the lines of those at Oxford and Cambridge, as a general social centre for student life; and we think, with the Dacca University committee, that all members of the teaching staff and all the students should belong to it. (*Calcutta University Commission, 1917-19*: 225-226)

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটির (নাথান কমিটি) শারীরিক শিক্ষা বিষয়ক রিপোর্টকে স্বাগত জানিয়েছিলেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় এবং হল সংলগ্ন উন্মুক্ত খেলার মাঠের সুপারিশ করেন। একই সাথে সুসজ্জিত একটি জিমনেসিয়ামের জন্য সুপারিশ প্রদান করেন। খেলাধুলায় পারদর্শী এবং শারীরিকভাবে সক্ষম শিক্ষার্থীদের বিশেষ প্রণোদনা রাখারও প্রস্তাব করা হয়।[২]

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের চূড়ান্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে রমনার বিস্তৃত সবুজ প্রাঙ্গণের সুপরিসর এলাকাজুড়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস স্থাপন করা হয়েছিল। আসাম-বেঙ্গল প্রদেশের রাজধানীর জন্য নির্মিত সুউচ্চ ভবন, কার্জন হল এলাকা, পুরাতন সেক্রেটারিয়েট ভবন, বিশাল খেলার মাঠ, বিস্তীর্ণ প্রান্তর, বড় বড় জলাধার, সবুজের সমারোহ ইত্যাদি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আনন্দময় ক্যাম্পাস তৈরির প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের সাক্ষ্য বহন করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকালীন ক্যাম্পাস ধীরে ধীরে সঙ্কুচিত হয়েছে। তবুও এই ক্যাম্পাসের বড়োত্বের ধারণা ও প্রায়োগিক শিক্ষার সংস্কৃতি চর্চা অব্যাহত রয়েছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের স্বপ্ন অনুসারে 'মন, শরীর ও চারিত্রিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সত্যিকারের শিক্ষালাভের'[৩] আকাঙ্ক্ষা নিয়ে এখানে শিক্ষার্থীদের আগমন ঘটেছিল। অধ্যাপক এ কে নাজমুল করিমের মতে, 'কেবল উচ্চশিক্ষায় অগ্রসর মুসলিম সমাজকে সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্যই যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা নয়, আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রকৃত শিক্ষা এবং ছাত্র-ছাত্রীদের ভিতর "বিদ্যার বুলি" আওড়ানোর পরিবর্তে মৌলিক চিন্তাবিকাশের সুযোগ-সুবিধার জন্যই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয়'। এ প্রসঙ্গে এর প্রথম ভাইস চ্যান্সেলর পিজে হার্টগ প্রদত্ত ভাষণ প্রণিধানযোগ্য–

> It is of the essence of the true University teachers that it should cultivate the individual mind and individual judgement degree in promise, it is not performance of and cannot be weighed against the performance of life. I fear that, to take great examples, men like Darwin, Newman, Mathew Arnold, John Richard Green, Tyndall, W.E. Ayaston men of different degrees of distinction but whose names are all known in the University in the world, would have been regarded as Second-class men by the persons to whom I refer because they took relatively poor degrees or none at all. It is right to count degrees where you have no other evidence to go on. After 10 years a man should have done work of some kind or over shadow entirely the performance in the examination room of his youth. (নাজমুল, ক্রোড়পত্র, দৈনিক ইত্তেফাক, ১৫ আগস্ট, ১৯৭৫: ২)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য বহুলাংশে বাস্তবায়িত হয়েছে তা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য ছুটিতে বাসায় থাকার সময়ের চেয়ে হলে অবস্থানকালীন ভালো ছিল বলে ১৯২৯ সালে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক গঠিত ইন্ডিয়ান স্ট্যাটুটারি কমিশনের রিপোর্টে উঠে এসেছে।[৪] এটি অবশ্যই এ পাঠ্যবহির্ভূত শিক্ষাকার্যক্রমের কারণে সম্ভব হয়েছিল। কেননা ঢাকা কেবল একটি পাঠসর্বস্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। আর ব্রিটিশ সরকার বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেই ক্ষান্ত থাকেনি এটিতে হাতেকলমে শিক্ষা প্রদানের সকল প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছিল তা বোঝা যায় সাইমন কমিশনের একই রিপোর্টে- 'শিক্ষা কেবল লেকচার, বই, বা নোটের বিষয় নয়- এমন একটি উপলব্ধি ক্রমেই জোরালো হচ্ছে। শিক্ষা হলো ব্যক্তিত্বের সজীব সংস্পর্শের বিষয়-শিক্ষার্থীর সঙ্গে শিক্ষার্থীর, শিক্ষার্থীর সঙ্গে শিক্ষকদের আন্তঃসম্পর্কের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা এক জীবন্ত প্রক্রিয়া Indian Statutory Commission 1929: 142)। আর এ ধরনের একটি জীবন্ত প্রক্রিয়া সম্ভব কেবল শ্রেণিকক্ষের শিক্ষার সাথে পাঠক্রমবহির্ভূত সহশিক্ষার সমন্বয় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধিবদ্ধ সহশিক্ষামূলক শিক্ষাকার্যক্রম

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহশিক্ষা তথা পাঠ্যবহির্ভূত শিক্ষার গুরুত্ব দিয়েছে। আর এসকল কাজকে উৎসাহিত করার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার দেড় মাসের মধ্যেই মুসলিম হলে প্রথম হল ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর অন্য দুইটি হলেও হল ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হয়। এই তিনটি হল ইউনিয়ন নিয়ে ১৯২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রসংসদ' গঠিত হয়। ১৯৫৩ সালে এর নামকরণ করা হয় 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ' (ডাকসু) নামে (শরীফ ২০২১: ৫১০-৫১৩)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকালীন শিক্ষক নির্মল চন্দ্র পাল ১৯৪৪ সালের ১৩ই মে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার পদের জন্য প্রেরিত আবেদনপত্রে তাঁর অভিজ্ঞতার বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন−

> Through the period of my service in this University I have taken a keen interest in the corporate activities of students and have been a frequent speaker in their debates and meetings. There have been very few extra-academic functions in the university during the last 20 years for which my services were not required (Office of the Dacca University, ফাইল-২, রেজি: অফিস ১৯৪৪-৪৭)

সেসময় শিক্ষক বা প্রশাসনিক কাজে নিয়োগের ক্ষেত্রে অ্যাকাডেমিক যোগ্যতার সাথে শিক্ষার্থীদের সহশিক্ষা কার্যক্রমে জড়িত থাকার অভিজ্ঞতা অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসেবে প্রাধান্য পেত। উপরিউক্ত পত্রে উল্লিখিত বিষয় ছাড়াও লেখক ছাত্রদের খেলাধুলার সাথেও তাঁর সংশ্লিষ্টতার কথা উল্লেখ করেন।

এ থেকে ধারণা করা যায় যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ধরনের কার্যক্রমের গুরুত্ব ছিল অনেক। পাঠ্যক্রম বহির্ভূত সহশিক্ষাকার্যক্রম এ বিশ্ববিদ্যালয়কে স্বতন্ত্র উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছিল তা ১৯২১ শিক্ষাবর্ষের একজন শিক্ষার্থীর স্মৃতিকথায় উঠে এসেছে। তিনি বলেন,

> শহর বা শহরের বহিরাঞ্চলে অবস্থিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত সরকারি বা বেসরকারি কলেজসমূহ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কতকগুলি মৌলিক পার্থক্য ছিল। ঢাকা ছিল আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়। এর অর্থ ছিল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শুধু পাঠ্যানুক্রম তৈরি করে এবং পরীক্ষা গ্রহণের কাজ করেই ক্ষান্ত ছিল না, সরাসরি শিক্ষাদানের দায়িত্ব তাঁহার উপর ন্যস্ত ছিল। পক্ষান্তরে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত পাঠ্যানুক্রম অনুযায়ী শিক্ষাদানের দায়িত্ব ছিল উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত কলেজসমূহের। অধিকতর লক্ষণীয় পার্থক্য যা ছিল তা হচ্ছে 'ব্যক্তিগত ও সার্বিক ক্রমবিকাশের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সুযোগ- সুবিধা। স্বকীয় উদ্যোগ, চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব গঠনের সুযোগ-সুবিধা ছিল এখানে প্রচুর'। (হাফিজুর, ক্রোড়পত্র, দৈনিক ইত্তেফাক, ১৫ আগস্ট, ১৯৭৫: ৭)

শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল ধারণাগুলোকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করা হতো। শ্রেণিকক্ষ কিংবা শ্রেণিকক্ষের বাইরে শিক্ষকরা ছাত্র-ছাত্রীদের পরিপূর্ণ শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহিত করতেন। বাস্তবতা হলো, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতেন পূর্ববাংলার প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে আসা ছেলেমেয়েরাই। এ সকল শিক্ষার্থীদের অধিকাংশেরই গ্রামের নির্দিষ্ট গণ্ডির বাইরে যাওয়ার অভিজ্ঞতা এটিই প্রথম। বিভিন্ন মফস্বল অঞ্চল থেকে তাঁরা এসে আবাসিক হলে অবস্থান গ্রহণ করতেন। গ্রাম থেকে একেবারে নতুন পরিবেশে আসা এসব ছেলে-মেয়েরা স্বাভাবিকভাবেই একঘেয়েমি এবং বাড়ির টান অনুভব করতেন। এসব শিক্ষার্থীদের হলে অবস্থান করা তথা শিক্ষার্থীদের যৌথজীবন ব্যবস্থাকে আকর্ষণীয় করে গড়ে তোলার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা পদক্ষেপ ছিল।

শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ধরনের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাজে ব্যস্ত রাখার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে যেসকল বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল সেসবের কয়েকটির গঠন ও কার্যক্রম সম্পর্কে নিচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ এবং হল সংসদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কার্যক্রমের প্রধান কেন্দ্র ছিল হল সংসদ ও কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ[৫]। এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ধরনের সহশিক্ষামূলক কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ পেতেন যার নেতৃত্ব প্রদান করতেন শিক্ষার্থীরাই। সিলেবাসভুক্ত শিক্ষা কার্যক্রমকে পূর্ণতাদান এবং নেতৃত্বের গুণাবলি বিকাশে এসব কার্যক্রম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেন্ডারে এ বিষয়ে একটি পরিষ্কার চিত্র প্রদান করা হয়েছে–

> The social life of the Hall is controlled by this committee (Hall Union). It also maintains common rooms, where facilities are provided not only for reading the important newspapers and journals but also indoor games. It organizes and entertainments and hold meetings at which distinguished persons are invited to lecture on subjects of general interest. Each hall union publishes an annual journal. Under the general control of each Hall union, there is a literary union, a social service league, a drama club, an athletic club, a science colloquium and seminars in different subjects, all which are managed by students themselves

> and thus this process helps in developing a vigorous corporate and academic life among students. (*The Calendar,* The University of Dhaka, 1953, V. 1, Part I, p. 4-5)

পরিবার ছেড়ে আশা শিক্ষার্থীদের একঘেয়েমি কাটানো তথা মনের গহীনে লুকিয়ে থাকা অমিত সম্ভাবনার বিকাশ ঘটানোর ক্ষেত্রে উপরিউক্ত কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল তা বলাই বাহুল্য। শিক্ষার্থীদের সামাজিক, নৈতিক ও ধর্মীয় জীবন সঠিকভাবে পরিচালনা এসব কার্যক্রমের অন্যতম লক্ষ্য। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের পাশাপাশি হল লাইব্রেরি ও অন্যান্য সংগঠনকে এমনভাবে সাজানো হয় যাতে সেখানে বিনোদনমূলক উপকরণও যথেষ্ট পরিমাণ থাকে। সেখানে পড়ালেখার পাশাপাশি খেলাধুলার যথেষ্ট সুযোগ থাকবে সে বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করা হয়[৬]। আবাসিক হলসমূহে সহশিক্ষা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে যেসব খেলাধুলা সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধা রাখার ব্যবস্থা করা হয় তার মূল লক্ষ্য ছিল শিক্ষার্থীদের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ প্রতিযোগিতাকে উৎসাহিত করা, যৌথজীবন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং দেহ-মনের বিকাশ ঘটানো। এসব অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিকাশ ঘটে সাংগঠনিক দক্ষতা ও নেতৃত্বের গুণাবলি। বিশ্ববিদ্যালয়ের গন্ডি বেরিয়ে শিক্ষার্থীরা যখন কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে তখন এসব অভিজ্ঞতা সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এসব সাংগঠনিক কার্যক্রম শিক্ষার্থীদের দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে উঠতে কিভাবে সহায়তা করতো তা ত্রিশ-এর দশকের একজন সাবেক শিক্ষার্থীর স্মৃতিকথায় সুন্দরভাবে মূর্ত হয়ে ওঠে –

> কেন্দ্রীয় ইউনিয়নের মাধ্যমে ইন্টার ইউনিভার্সিটি ও ইন্টার হল বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হতো। এছাড়া ইন্টার হল খেলাধুলা ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা ছিল। ডিসেম্বর ও জানুয়ারি মাসে প্রতি হলে পালা করে সাংস্কৃতিক সপ্তাহ পালন করা হতো। প্রায় দুমাস গোটা বিশ্ববিদ্যালয় আনন্দে মেতে থাকতো। এখানেই এ বিশ্ববিদ্যালয়ের আসল আকর্ষণ, বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা। কেন্দ্রীয় হল ইউনিয়নের মাধ্যমে ছাত্ররা পরবর্তীকালে জাতীয় জীবনে উপযুক্ত নাগরিকের দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ লাভ করতো। (জাহাঙ্গীর, ১৯৯২: ৮১-৮২)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ সামাজিক-সাংস্কৃতিক কাজে নেতৃত্বের অগ্রভাবে ছিল।

ডাকসু কর্তৃক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ধানচাষ প্রকল্প, (ছবি: ক্রোড়পত্র: দৈনিক ইত্তেফাক, ১৫ আগস্ট, ১৯৭৫)

ডাকসু আন্তঃহল বিতর্ক প্রতিযোগিতা, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক সপ্তাহ, সাঁতার প্রতিযোগিতা, নবীন বরণ আয়োজনের মাধ্যমে টিএসসি কেন্দ্রিক ক্রীড়া ও সংস্কৃতি চর্চাকে বেগবান করতো। বিগত শতকে ডাকসু এবং হল সংসদ বাংলাদেশে অধিকার সচেতন নাগরিক সৃষ্টিতে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করেছে। বাংলাদেশের মুক্তির সংগ্রামে এদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। এ ছাড়া নির্বাচনের মাধ্যমে সংসদ গঠনের সংস্কৃতি শিক্ষার্থীদের মধ্যে গণতান্ত্রিক চর্চা ও শান্তিপূর্ণ প্রতিদ্বন্দ্বিতার মূল্যবোধ সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের মাধ্যমে বাংলাদেশের দ্বিতীয় পার্লামেন্ট খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটে শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধি প্রেরণের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা সংসদীয় গণতান্ত্রিক রীতিনীতি চর্চার সুযোগ লাভ করে। ফলে তারা সিনেটের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অধিকারের কথা কর্তৃপক্ষের সামনে উপস্থাপন করতে পারে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হল ও কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জীবনমান উন্নয়ন এবং অন্যান্য অধিকার আদায়ের পক্ষে সমর্থনমূলক তৎপরতা চালানোর পাশাপাশি বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তির আন্দোলনেও নেতৃত্ব দিয়েছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদের প্রথম সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ছিলেন- যথাক্রমে মমতাজ উদ্দিন আহমেদ এবং যোগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। এছাড়া বেগম জাহানারা আখতার, শ্যামাপ্রসাদ ঘোষ, মো. এনায়েতুর রহমান, কে এম ওবায়েদুর রহমান, রাশেদ খান মেনন, মতিয়া চৌধুরী, ফেরদৌস আহমদ কোরেশী, শফি আহমদ, মাহফুজা খানম, তোফায়েল আহমেদ, নাজিম কামরান চৌধুরী, আ স ম আবদুর রব, আব্দুল কুদ্দুস মাখন, মোজাহিদুল ইসলাম সেলিম, মাহমুদুর রহমান মান্না, আখতারুজ্জামান, জিয়াউদ্দিন বাবলু, প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ ডাকসুতে নেতৃত্ব প্রদানের ধারাবাহিকতায় জাতীয় রাজনীতিতে খ্যাতি অর্জন করেন।

শারীরিক শিক্ষাকেন্দ্র

১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই শরীরচর্চা এবং খেলাধুলার জন্য প্রশিক্ষক নিয়ে দেওয়া হয়েছিল (Rahim, 1981: 160)। খেলাধুলার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের জন্য এই বিশ্ববিদ্যায়ের সূচনার কয়েক মাসের মধ্যে 'ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যাথলেটিক ক্লাব' গঠন করা হয় যা পরবর্তীকালে 'ঢাকা 'বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাথলেটিক বোর্ড' নাকরণ হয়। সর্বশেষ এটি ১৯২৫ সালে শারীরিক শিক্ষাকেন্দ্রে রূপান্তরিত হয় যেটি অদ্যাবধি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ক্রীড়াশিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরিক শিক্ষাকেন্দ্র খেলাধুলা ও শরীরচর্চার প্রতি গুরুত্ব প্রদানের যথেষ্ট কারণ ছিল। পাশ্চাত্যের বিশ্ববিদ্যালয়ের আদলে এই বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলার জন্য এটি যেমন সহায়ক ছিল, একই সাথে মফস্বল অঞ্চল থেকে আসা শিক্ষার্থীদের শারীরিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের আবশ্যকতা দেখা দিয়েছিল। কেননা, শিক্ষার সাথে দেহমনের সুস্থতার গভীর সম্পর্ক রয়েছে। ১৯২৬ সালে শারীরিক শিক্ষাকেন্দ্রের ক্রীড়া ইন্সট্রাক্টর সার্জেন্ট ই ই ফিলিপস এক সমীক্ষায় দেখতে পান যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭৫ শতাংশ শিক্ষার্থীই ছিল শারীরিকভাবে দুর্বল যা শিক্ষাক্ষেত্রে মনোনিবেশ করার অন্তরায় ছিল। সে কারণে প্রত্যুষে উঠে ড্রিল করা সকল ছাত্রের জন্য আবশ্যক করা হয়েছিল (আবুল, ২০২০: ৩৫২)। শারীরিক শিক্ষার বিষয়কে গুরুত্ব প্রদান করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এ সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যালেন্ডারে বলা হয়েছে-

> Every student shall be required to pursue a course of physical instruction arranged by the physical Director unless, after being specially examined by the University medical officer, he should be exempted by the provost concerned on

the recommendation of the medical officer (The Calendar, The University of Dhaka, 1953, Vol-1, Part, IV. p. 66)

১৯৭৭-৭৮ সালের বার্ষিক বিবরণীতেও ১ম ও ২য় বর্ষের সকল ছাত্র-ছাত্রীর পরবর্তী শ্রেণিতে উন্নীত হওয়ার জন্য সকল শিক্ষার্থীকে বাধ্যতামূলক শরীরচর্চায় অংশগ্রণ করা এবং প্রতি সেশনে কমপক্ষে ৪০দিন শরীরচর্চার কর্মসূচিতে উপস্থিত থাকার বাধ্যবাধকতার বিষয়টি উঠে এসেছে। একই প্রতিবেদনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হলসংলগ্ন ৩টিসহ ৪টি বড় সাইজের খেলার মাঠ, ৯টি বাস্কেটবল এবং ১০টি টেনিস হার্ডকোটের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

আগের যুগে বিনোদনের মাধ্যম সীমিত ছিল সে কারণে শিক্ষার্থীরা খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে বিনোদনের অনুষঙ্গ খুঁজে পেতো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠ সারা বছর ধরে বিভিন্ন ধরনের ক্রীড়া চর্চায় মুখরিত থাকে। বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরিক শিক্ষাকেন্দ্রের অধীনে বছরব্যাপী অ্যাথলেটিক্স, জিমন্যাস্টিক্স, ক্রিকেট, ফুটবল, হকি, বাস্কেটবল, ব্যাডমিন্টন, ভলিবল, হ্যান্ডবল, দাবা, জুডো ও কারাতে, টেনিস, টেবিল টেনিস, ক্যারম, উঁসু, তায়াকন্দ, সাঁতার, ওয়াটার পোলো ইত্যাদির অনুশীলন করা হয়।

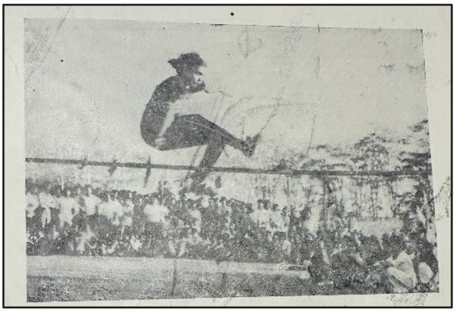

সত্তরের দশকে শারীরিক শিক্ষাকেন্দ্রে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ছাত্রীদের উচ্চলম্ফ এবং ছাত্রদের ১০০ মি. দৌড়-এর চিত্র (ছবি: ৫৭তম বার্ষিক বিবরণী)

বছরের নির্দিষ্ট সময়ে আন্তঃহল, আন্তঃবিভাগ পর্যায়ে প্রতিযোগিতা শেষে ভালো নৈপুণ্যের অধিকারী শিক্ষার্থীরা আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে। বিশেষ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের বিশ্ববিদ্যালয়েও প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ পেয়ে থাকে। ক্রীড়া ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান এবং সদাচরণের অধিকারী শিক্ষার্থীদের ১৯৬৩ সাল থেকে খেলাধুলার সর্বোচ্চ খেতাব ব্লু প্রদান করা হয়ে থাকে। ২০১১ সাল পর্যন্ত ১৮৫জন শিক্ষার্থী 'ব্লু অ্যাওয়ার্ডে' ভূষিত হয়েছেন (শারীরিক শিক্ষাকেন্দ্র, ব্লু অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তদের তালিকা, অপ্রকাশিত)। এসকল ব্লু অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত খেলোয়াড়রা পরবর্তীকালে ক্রীড়া সংগঠক হিসেবে এবং সমাজ-সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক অঙ্গনে খ্যাতি লাভ করেছেন এবং সফল উদ্যোক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। এদের মধ্যে, বশির আহমেদ (হকি), মেজর (অব.) হাফিজুদ্দীন (ফুটবল), আলতাফ হোসেন (অ্যাথলেটিকস্), শফিকুল হক হীরা (ক্রিকেট) বেগম সুলতানা আহমেদ (অ্যাথলেটিকস্) নওশের হাসান (বাস্কেটবল), রকিবুল হাসান (ক্রিকেট), নুরুল ইসলাম (হকি), ওয়াহিদুজ্জামান পিন্টু (ফুটবল), মো. শফিকুল ইসলাম মানিক (ফুটবল), মো. ওয়াসিফ আলী (বাস্কেটবল), মো. ছাইদ হাসান কানন (ফুটবল), মেহাম্মদ কায়সার হামিদ (ফুটবল), সত্যজিৎ দাস রুপু (ফুটবল), টুটুল কুমার নাগ (হকি), রাশিদা আফজুলূন নেছা (হ্যান্ডবল), মো. জহুরুল ইসলাম অমি (ক্রিকেট) উল্লেখযোগ্য। 'ব্লু' খেতাবপ্রাপ্তদের বাইরেও

বহুসংখ্যক শিক্ষার্থী বাংলাদেশের ক্রীড়াজগতের সফল সংগঠক ও নেতা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন। এসকল খেলোয়াড়দের অনেকে অন্যপেশাতেও সফলতার পরিচয় দিয়েছেন।

খেলাধুলায় আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে একসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান ছিল শীর্ষ পর্যায়ে। ১৯৭৭-৭৮ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনে দেখা যায়, সেই শিক্ষাবর্ষে আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবলে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন, জাতীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় জোনাল চ্যাম্পিয়ন, প্রথম বাংলাদেশ অলিম্পিকের অ্যাথলেটিকস্-এ ৪০০মিটার দৌড়ে জাতীয় রেকর্ড, ৮০০মিটার দৌড়, এবং লৌহগোলক নিক্ষেপ প্রতিযোগিতায় জাতীয় রেকর্ড ভঙ্গসহ ৩টি স্বর্ণ, ৩টি রৌপ্য, ৪টি তাম্রপদক লাভ করে। ১ম বাংলাদেশ অলিম্পিকের বাস্কেটবল, ভলিবলে চ্যাম্পিয়ন, জিমন্যাষ্টিক্স-এ ২টি স্বর্ণ একটি তাম্র, বক্সিং লাইট ওয়েটে গোল্ডমেডেল, সুটিং-এ ব্রোঞ্জ, জাতীয় ব্যাডমিন্ট প্রতিযোগিতায় মহিলা একক, মহিলা দ্বৈত, মহিলা-পুরুষ মিশ্র দ্বৈতে চ্যাম্পিয়ন, জাতীয় জুডোতে ১টি গোল্ড, ৩টি সিলভার, ১টি ব্রোঞ্জ, জাতীয় দাবায় গোল্ড মেডেল এবং কুয়ালালামপুরে এশিয়ান বক্সিং এ ১টি ব্রোঞ্জ পদকসহ সে বছর আরও কৃতিত্বপূর্ণ অর্জনের তথ্য জানা যায় (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৫৭তম বার্ষিক বিবরণী ১৯৭৭-৭৮: ৪২৫-৪২৮)। ২০২২-২০২৩ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন অনুযায়ী আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ক্রিড়া প্রতিযোগিতা আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল, জাতীয় জুডো প্রতিযোগিতা, আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় স্পোর্টস চ্যাম্পিয়নশীপ, ক্রিকেট এবং অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে আশানুরূপ ফল অর্জন করতে পারেনি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে ফুটবলে যুগ্ম-চ্যাম্পিয়ন এবং আন্তবিশ্ববিদ্যালয় স্পোর্টস চ্যাম্পিয়নশীপে ফেয়ার প্লে ট্রফি গ্রহণ করে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। অন্যান্য ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য আসেনি।[৭] খেলাধুলায় অতীতের গৌরব ধরে রাখতে না পারার কারণ অনুসন্ধান করা জরুরি। এতদসত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়ে তথা আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ও জাতীয় পর্যায়ে খেলাধুলায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে মনোবল বৃদ্ধি, সামাজিকীকরণ এবং মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন নাগরিক সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে তাতে কোনোই সন্দেহ নেই।

খেলাধুলার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম বৃদ্ধির পাশাপাশি আগামীদিনের বলিষ্ঠ নেতৃত্বের গুণসম্পন্ন নাগরিক হিসেবে নিজেদের গড়ে তুলতে সক্ষম হন। খেলাধুলার অতীত ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার জন্য অতীতের অর্জনসমূহ বর্তমান প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের জন্য অনুপ্রেরণাদায়ক হতে পারে। বর্তমান গবেষণায় দেখা যায়, খেলাধুলার অনেক অবকাঠামো নষ্ট হয়ে গেছে, কিছু খেলা এখন আর হয় না। কেন্দ্রীয় খেলার মাঠ ছাড়া অন্যান্য মাঠগুলোয় শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি খুব বেশি আশাব্যঞ্জক নয়। একসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের শারীরিক শিক্ষাকেন্দ্র বিলিয়ার্ড, রেসলিং অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং সুটিং- অনুশীলনের জন্য সুটিং রেঞ্জও ছিল যা বর্তমানে নেই।

বিএনসিসি[৮], রোভার স্কাউট[৯], রেঞ্জার[১০]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ১৯২৩ সালে ইউনিভার্সিটি ট্রেনিং কোর (ইউটিসি) গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে। সরকারি অনুমোদনের পর ১৯২৭ সালে ইউটিসি গঠিত হয় যা ১৯৪০ সালে এর নামকরণ হয় ইউওটিসি। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে ইউওটিসির অনেক সদস্য মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিয়ে বীরত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। ১৯৭৯ সালে বাংলাদেশ সরকার এটিকে বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর হিসেবে নামকরণ করেন (Rahim, 1981: 160)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর (বিএনসিসি) অসাধারণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। বিএনসিসি'র উদ্দেশ্য সমূহের মধ্যে রয়েছে, যুব সমাজের নৈতিক উন্নয়ন সাধন, নেতৃত্বের গুণাবলি বিকাশ, দেশসেবা ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করা,

পারস্পারিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার মনোভাব গঠন, দ্বিতীয় সারির প্রতিরোধ বাহিনী হিসেবে তরুণ ছাত্রসমাজকে সামরিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেন তারা সামরিক বাহিনীতে কমিশন লাভ করতে পারে। জাতীয় দুর্যোগ ও দেশের প্রয়োজনে স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী হিসেবে শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করাও এর অন্যতম লক্ষ্য। বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা নিয়মিত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। ন্যাশনাল ক্যাডেট কোরের সদস্যরা ১৯৭৯-৮০ সনে নিয়মিত কার্যক্রমের বাইরে পুলিশের ট্রাফিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ, ফটোগ্রাফি কর্মশালায় অংশগ্রহণ, নিরক্ষরতা দূরীকরণে নৈশবিদ্যালয় পরিচালনা, হাঁস-মুরগীর খামার প্রতিষ্ঠা, রোগপ্রতিরোধে টিকা প্রদান, বৃক্ষরোপণ ও উন্নত ফলনের সজি চাষ, মৎস খামার প্রতিষ্ঠা, এবং কালিয়াকৈর থানায় খাল খনন ও উঁচু বাঁধ নির্মাণ করে ১৪০০ একর জমি চাষের আওতায় নিয়ে আসে। (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৫৯তম বার্ষিক বিবরণী ১৯৭৯-৮০: ২৭) বিএনসিসি'র পাশাপাশি বাংলাদেশে স্কাউট আন্দোলনের অন্যতম পাদপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৬০-এর দশকের শুরুতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রোভার স্কাউট প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সংগঠনের মূল মন্ত্র 'সেবাই ধর্ম' (Rahim, 1981, p. 164)। এছাড়া রয়েছে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন রেঞ্জার ইউনিট। রেঞ্জারের মূলনীতি হলো- মানবতা, সেবা, সমাজ সচেতনতা, কর্তব্যনিষ্ঠা হওয়া, সদা জাগ্রত মানসিক প্রস্তুতি। এরা গণশিক্ষা, বৃক্ষরোপণ, বস্তির উন্নয়ন, টিকাদান এই চারটি প্রকল্প পরিচালনা করে থাকে।

বামে বিএনসিসি ক্যাডেটদের মার্চপাস্টে উপাচার্য কর্তৃক সালাম গ্রহণ (ছবি: ক্রোড়পত্র: দৈনিক ইত্তেফাক, ১৫ আগস্ট, ১৯৭৫) এবং ডানে বিশ্ববিদ্যালয় ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় সপ্তাহব্যাপী রেঞ্জার ইউনিটের কলেরা টিকাদান কর্মসূচি (ছবি: ৫৭তম বার্ষিক বিবরণী)

উপরিউক্ত তিনটি প্রতিষ্ঠানই শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ধরনের শারীরিক ও মানসিক প্রশিক্ষণ প্রদান করে। এর মাধ্যমে, শৃঙ্খলা, সেবা ও ত্যাগের মনোভাব তাঁদের মধ্যে প্রোথিত হয় যা দেশপ্রেমিক নাগরিক সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। কায়িক পরিশ্রম, মানব সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করার মনোভাব, মানবপ্রেম ও ধৈর্যের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব নিয়মানুবর্তিতার মনোভাব গড়ে ওঠে। এসকল সংগঠনে যুক্ত শিক্ষার্থীরা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়ে থাকেন। বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং রোগের প্রাদুর্ভাবে, জাতীয় দিবস, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজনে বিএনসিসি, রোভার এবং রেঞ্জার পেশাদার বাহিনীর অনুরূপ শৃঙ্খলা বজায় রেখে দায়িত্ব পালন করে থাকেন। বিশেষ করে একুশে ফেব্রুয়ারির মতো একটি

বড় জাতীয় দিবসে দুইদিন ব্যাপী নিরলস পরিশ্রম করে অনুষ্ঠান বাস্তবায়ন করেন। একুশে ফেব্রুয়ারি ইউনেস্কো কর্তৃক আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতি লাভ করার পর এর পরিধি আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। একুশে ফেব্রুয়ারি রাতের প্রথম প্রহর থেকে পরের দিন বিকেল পর্যন্ত লাখো মানুষের জনস্রোত সুশৃঙ্খল রাখা, মানুষের নিরাপত্তা, বেদী ব্যবস্থাপনা থেকে সকল ক্ষেত্রেই এই তিন ইউনিটের সদস্যরা আন্তরিকভাবে সেবা প্রদান করে থাকেন। এই কার্যক্রমের মাধ্যমে একদিকে সেবার মনোভাব তৈরি হয় অন্য দিকে ধৈর্য, কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে টিকে থাকার সমক্ষমতা শিক্ষার্থীর মধ্যে তৈরি হয়।

বাঁধন (স্বেচ্ছায় রক্তদান সংগঠন)

উপরোক্ত বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের বাইরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়, সেটি হলো বাঁধন। বাঁধন স্বেচ্ছায় রক্তদাতাদের একটি সংগঠন। 'একের রক্ত অন্যের জীবন, রক্তই হোক আত্মার বাঁধন', এটি বাঁধনের শ্লোগান। বাঁধন প্রতিষ্ঠার পূর্বে মেডিকেল শিক্ষার্থীদের দ্বারা পরিচালিত সন্ধানী অথবা রেডক্রস সোসাইটির মাধ্যমে রক্তদানের কর্মসূচি পরিচালিত হতো। সন্ধানীর রক্ত দানের পদ্ধতি ছিল রক্ত সংগ্রহ করে ব্লাড ব্যাংকে সংরক্ষণ করা এবং রোগীর রক্তের চাহিদা অনুযায়ী ব্লাড ব্যাংক থেকে তাদেরকে রক্ত সরবরাহ করা হয়। কিন্তু বাঁধন সরাসরি রক্ত সরবরাহের পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এরা ব্লাড ব্যাংকের পরিবর্তে রক্তদাতাদের 'ডাটাব্যাংক' তৈরি করে। বিশেষ করে ৯০-এর দশকের শুরুতে বাংলাদেশে ওপেন হার্ট সার্জারি শুরু হলে অপারেশনের সময় হিমায়িত রক্তের পরিবর্তে স্বাভাবিক তাপমাত্রার রক্তের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। অনেক ক্ষেত্রে একজন রোগীর জন্য ১০ থেকে ১২ ব্যাগ বা তারও বেশি রক্তের প্রয়োজন হয়। এ ছাড়া সিজার অপারেশন, থ্যালাসেমিয়া, হেমোফিলিয়া, বার্ণ ইত্যাদি রোগীর জন্য জরুরি রক্তের প্রয়োজনে রোগীর আত্মীয় স্বজনরা হলে ছাত্রদের কাছে আসতেন। রক্তের গ্রুপ না জানায় দলবেঁধে শিক্ষার্থী হাসপাতালে গিয়ে রক্তের গ্রুপ পরীক্ষা করেতেন। এসময় যাদের রক্তের গ্রুপ রোগীর সাথে মিলত তারা রক্তদান করতেন। কখনো বা একজনেরও মিলতো না।

১৯৯৭ সালে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ হলে পরিচালিত একটি জরিপে দেখা যায় শতকরা ৮১ শতাংশ ছাত্ররা তাদের রক্তের গ্রুপ জানে না। মৃত্যুপথযাত্রী রোগীকে সঠিক সময়ে রক্ত সরবরাহের জন্য একটি সঠিক ব্লাড গ্রুপের তালিকা থাকা জরুরি। এসব ভাবনা থেকেই ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ হলের প্রাণ রসায়ন ও অনুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র শাহিদুল ইসলাম রিপনের উদ্যোগে ২৭ জন শিক্ষার্থীর প্রচেষ্টায় ১৯৯৭ সালের ২৪শে অক্টোবর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঁধনের আত্মপ্রকাশ ঘটে (স্মরণিকা, বাঁধনের রজতজয়ন্তী সংখ্যা, ২৪ অক্টোবর, ২০২২: ৪০-৪১)। বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল হল ও হোস্টেলে বাঁধনের শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাঁধন এমন একটি সংগঠন যেখানে হলের প্রায় সকল শিক্ষার্থীই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ডোনার বা নিয়মিত সদস্য হিসেবে বাঁধনের সাথে যুক্ত রয়েছে। নন মেডিক্যাল শিক্ষার্থীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এই সংগঠনটি বর্তমানে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় রক্তদাতা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত এই সংগঠনটি প্রায় সারা দেশের ১৭টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং ৫৯টি কলেজের ১৪০টি[১১] ইউটিনের মাধ্যমে সেবা প্রদান করে যাচ্ছে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত বাঁধনের স্বেচ্ছায় রক্তদানের পরিমাণ ১০,৩৮,১০৬ ব্যাগ এবং বিনামূল্যে রক্তের গ্রুপ নির্ণয় ২১,৪২,৩৩জন (বাঁধনের বার্ষিক সাধারণ সভা ও দায়িত্ব হস্তান্তর-২০২৪: ১৩) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল সেন্টারে বিশ্ববিদ্যালয়ের বরাদ্দকৃত জায়গায় ২০১৯ সালের ২৪ অক্টোবর একটি আধুনিক 'ট্রান্সফিউশান' সেন্টার চালু হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঁধনের কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে সারাদেশে বাঁধনের সেবা সমন্বয় করা হয়ে থাকে। বাঁধনের মতো

স্বোচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থীদের একদিকে মানবিক হতে শেখায় অন্যদিকে দায়িত্বান নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলে। একইসাথে এর সাথে যুক্ত শিক্ষার্থীরা মেডিক্যাল টেকনোলজির একটি প্রাথমিক শিক্ষা– রক্তের গ্রুপ নির্ণয় এবং ব্লাড ট্রান্সফিউশন হাতে-কলমে শিখে থাকেন যা মানুষের জীবন বাঁচাতে সহায়তা করছে। বাঁধন সুত্রে জানা যায় বাঁধনের প্রতিষ্ঠাতা সদস্যগণ সকলেই বর্তমানে দেশে-বিদেশে পেশাগত জীবনে সফল। এভাবে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা জাতীয় জীবনে সর্বদা পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছে। রাজনৈতিক সকল আন্দোলন সংগ্রামে যেমন নেতৃত্ব প্রদান করেছে, একইভাবে সামাজিক-সাংস্কৃতিক তথা মানবিক কাজে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা থেকেছে সামনের সারিতে।

ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন

ক্রমবর্ধমান হারে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি এবং অনাবাসিক শিক্ষার্থীদের পাঠক্রম বহির্ভূত কার্যক্রম পরিচালনা এবং পরামর্শ সহযোগিতা প্রদানের জন্য ১৯৬১ সালে ছাত্র-বিষয়ক একটি বিভাগ খোলা হয়। এর প্রধান হন একজন পরিচালক। পরবর্তীকালে ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে উক্ত ছাত্র-বিষয়ক বিভাগকে এর সাথে একীভূত করা হয়। এভাবে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সম্মিলনের এক নতুন ধারা চালু হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনধারায় এটি একটি নতুন সংযোজন। এই কমপ্লেক্স ঢাকা শহরের মধ্যে সর্বাধিক ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন প্রেক্ষাগৃহ, লাইব্রেরি, পাঠকক্ষ, কলা ও সঙ্গীত কক্ষ, মঞ্চ, সুইমিং পুল, স্ব-পরিবেশিত ক্যাফেটেরিয়া ইত্যাদি সংযোজিত হয় (The Dacca University Brochure *a review of changes and developments during the decade 1958-68*, published-1968: 12-13) বর্তমান টিএসসি কমপ্লেক্স-এর উদ্বোধন হয় ১৯৬৬ সালে। বর্তমানে টিএসসির সুইমিংপুলটি[১২] চালু নেই।

সারাদিনের গুরুগম্ভীর ক্লাস ও ল্যাবের গবেষণার চাপ শেষে শিক্ষার্থীরা টিএসসি-কেন্দ্রিক বিনোদনমূলক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশ নিয়ে কিছুটা প্রশান্তি ও স্বস্তি খুঁজে পায়। এ কমপ্লেক্সটি দেখলেই বোঝা যায় এটি শিক্ষার্থীদের আপন ভুবন। বিকেল থেকে সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত অবধি টিএসসি মুখরিত থাকে শিক্ষার্থীদের আনাগোনায়। বিভিন্ন ধরনের সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনের কার্যক্রম চলে সংগঠনের নিজস্ব রীতিতে। কোনো দল বরান্দায় আবৃত্তি চর্চায় ব্যস্ত, কেউ বা নাটকের মহড়ায় বা মাইম অ্যাকশনে, কেউ সারা দিনের সংবাদ তৈরির সিরিয়াস কর্মে, কেউ মানবিক সেবার কাজে, কোনো একদল টেবিল পেতে সংগঠনের নতুন সদস্য সংগ্রহের কাজে, কেউ বা আবার গল্প-আড্ডায় মশগুল। বছরব্যাপী মূল অডিটোরিয়াম বুকিং থাকে বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজনে। স্বাধীনতার পর ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত টিএসসিতে প্রতি বছর গড়ে দুইশত পঞ্চাশটির মতো অনুষ্ঠান আয়োজনের তথ্য জানা যায়। ১৯৭৭-৭৮ সালের বার্ষিক বিবরণীতে সংশ্লিষ্ট শিক্ষাবর্ষে এ কেন্দ্রে বড় অনুষ্ঠানের সংখ্যা ২১৭টি (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৫৭তম বার্ষিক বিবরণী ১৯৭৭-৭৮: ৪২৩) এবং ১৯৭৯-৮০ সালে ৩০০টির অধিক অনুষ্ঠান আয়োজনের তথ্য পাওয়া যায় (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৯৫তম বার্ষিক বিবরণী, ১৯৭৯-৮০: ৯)। বর্তমানে এই সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। স্থান সঙ্কুলানের অভাবে টিএসসিতে বর্তমান সময়ে একই দিনে বিভিন্ন ভেন্যুতে একাধিক সংগঠনের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। এছাড়া ১৯৭৪ সাল থেকে ভাড়ার মাধ্যমে ঢাকা শহরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে টিএসসি অডিটোরিয়াম ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। এভাবে ক্যাম্পাসের বাইরের বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মিথস্ক্রিয়া তৈরিরও সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। অবশ্য পূর্ব থেকেই ঢাকা শহরের নাগরিকবৃন্দ টিএসসি কেন্দ্রিক সংস্কৃতি চর্চা উপভোগ করতে আসতেন। বর্তমানে টিএসসিতে ৩০টির অধিক সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে। ঢাকা

বিশ্ববিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র হতে পরিচালিত বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও স্বেচ্ছাসেবামূলক সংগঠনের একটি তালিকা নিচে দেওয়া হলো[১৩]:

ক্রমিক নং	সংগঠনের নাম	গঠন কাঠামো	প্রাতিষ্ঠানিক মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা
১	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রোভার স্কাউট	মডারেটর ও প্রধান স্কাউট লিডার: শিক্ষক রোভার স্কাউট লিডার: শিক্ষক রোভার সিনিয়র মেট: শিক্ষার্থী	কক্ষ বরাদ্দ আছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বাৎসরিক বাজেটের মাধ্যমে অনুদান পায়
২	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি	প্রধান উপদেষ্টা: উপাচার্য সভাপতি: শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক: শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে নির্বাচিত	কক্ষ বরাদ্দ আছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বাৎসরিক বাজেটের মাধ্যমে অনুদান পায়
৩	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ডিবেটিং সোসাইট	মডারেটর: উপাচার্য কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক সভাপতি: শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক: শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে নির্বাচিত	কক্ষ বরাদ্দ আছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বাৎসরিক বাজেটের মাধ্যমে অনুদান পায়
৪	স্বেচ্ছায় রক্তদাতাদের সংগঠন (বাঁধন)	মডারেটর: উপাচার্য কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক সভাপতি: শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক: শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে নির্বাচিত	কক্ষ বরাদ্দ আছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বাৎসরিক বাজেটের মাধ্যমে অনুদান পায়
৫	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চলচ্চিত্র সংসদ	মডারেটর: উপাচার্য কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক সভাপতি: শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক: শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে নির্বাচিত	কক্ষ বরাদ্দ আছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বাৎসরিক বাজেটের মাধ্যমে অনুদান পায়
৬	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফটোগ্রাফি সোসাইটি	মডারেটর: উপাচার্য কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক সভাপতি: শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক: শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে নির্বাচিত	কক্ষ বরাদ্দ আছে এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বাজেট পায়
৭	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় টুরিস্ট সোসাইটি	মডারেটর: উপাচার্য কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক সভাপতি:	কক্ষ বরাদ্দ আছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বাৎসরিক

		শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক: শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে নির্বাচিত	বাজেটের মাধ্যমে অনুদান পায়
৮	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইটি সোসাইটি	মডারেটর: উপাচার্য কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক সভাপতি: শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক: শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে নির্বাচিত	কক্ষ বরাদ্দ আছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বাৎসরিক বাজেটের মাধ্যমে অনুদান পায়
৯	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মডেল ইউনাইটেড নেশন্স এসোসিয়েশন	মডারেটর: উপাচার্য কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক সভাপতি: শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক: শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে নির্বাচিত	কক্ষ বরাদ্দ আছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বাৎসরিক বাজেটের মাধ্যমে অনুদান পায়
১০	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রভাতফেরী সাংস্কৃতিক সংসদ	মডারেটর: উপাচার্য কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক সভাপতি: শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক: শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে নির্বাচিত	কক্ষ বরাদ্দ আছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বাৎসরিক বাজেটের মাধ্যমে অনুদান পায়
১১	জয়ধ্বনি সাংস্কৃতিক সংগঠন	মডারেটর: উপাচার্য কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক সভাপতি: শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক: শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে নির্বাচিত	কক্ষ বরাদ্দ আছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বাৎসরিক বাজেটের মাধ্যমে অনুদান পায়
১২	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নাট্য সংসদ	মডারেটর: উপাচার্য কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক সভাপতি: শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক: শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে নির্বাচিত	কক্ষ বরাদ্দ আছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বাৎসরিক বাজেটের মাধ্যমে অনুদান পায়
১৩	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যান্ড সোসাইটি	মডারেটর: উপাচার্য কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক সভাপতি: শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক: শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে	কক্ষ বরাদ্দ আছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বাৎসরিক বাজেটের মাধ্যমে অনুদান পায়

		নির্বাচিত	
১৪	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কালচারাল সোসাইটি	মডারেটর: উপাচার্য কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক সভাপতি: শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক: শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে নির্বাচিত	কক্ষ বরাদ্দ আছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বাৎসরিক বাজেটের মাধ্যমে অনুদান পায়
১৫	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কুইজ সোসাইটি	মডারেটর: উপাচার্য কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক সভাপতি: শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক: শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে নির্বাচিত	কক্ষ বরাদ্দ আছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বাৎসরিক বাজেটের মাধ্যমে অনুদান পায়
১৬	ঢাকা ইউনিভার্সিটি মাইম অ্যাকশন	মডারেটর: উপাচার্য কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক সভাপতি: শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক: শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে নির্বাচিত	কক্ষ বরাদ্দ আছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বাৎসরিক বাজেটের মাধ্যমে অনুদান পায়
১৭	ঢাকা ইউনিভার্সিটি সায়েন্স সোসাইটি	মডারেটর: উপাচার্য কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক সভাপতি: শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক: শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে নির্বাচিত	কক্ষ বরাদ্দ আছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বাৎসরিক বাজেটের মাধ্যমে অনুদান পায়
১৮	শ্লোগান'৭১	মডারেটর: উপাচার্য কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক সভাপতি: শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক: শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে নির্বাচিত	কক্ষ বরাদ্দ আছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বাৎসরিক বাজেটের মাধ্যমে অনুদান পায়
১৯	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশ সংসদ	মডারেটর: উপাচার্য কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক সভাপতি: শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক: শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে নির্বাচিত	কক্ষ বরাদ্দ আছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বাৎসরিক বাজেটের মাধ্যমে অনুদান পায়
২০	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাহিত্য সংসদ	মডারেটর: উপাচার্য কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক সভাপতি:	কক্ষ বরাদ্দ আছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বাৎসরিক

		শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক: শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে নির্বাচিত	বাজেটের মাধ্যমে অনুদান পায়
২১	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রিসার্চ সোসাইটি	মডারেটর: উপাচার্য কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক সভাপতি: শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক: শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে নির্বাচিত	কক্ষ বরাদ্দ আছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বাৎসরিক বাজেটের মাধ্যমে অনুদান পায়
২২	ঢাকা ইউনিভার্সিটি ক্যারিয়ার ক্লাব	মডারেটর: উপাচার্য কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক সভাপতি: শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক: শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে নির্বাচিত	কক্ষ বরাদ্দ আছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বাৎসরিক বাজেটের মাধ্যমে অনুদান পায়
২৩	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবৃত্তি সংসদ	মডারেটর: উপাচার্য কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক সভাপতি: শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক: শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে নির্বাচিত	কক্ষ বরাদ্দ আছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বাৎসরিক বাজেটের মাধ্যমে অনুদান পায়
২৪	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাইক্লিং ক্লাব	মডারেটর: উপাচার্য কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক সভাপতি: শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক: শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে নির্বাচিত	কক্ষ বরাদ্দ আছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বাৎসরিক বাজেটের মাধ্যমে অনুদান পায়
২৫	DU Timez	মডারেটর: উপাচার্য কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক সভাপতি: শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক: শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে নির্বাচিত	বিশ্ববিদ্যালয়ের বাৎসরিক বাজেটের মাধ্যমে অনুদান পায়
২৬	The Voice of Business	-	বিশ্ববিদ্যালয়ের বাৎসরিক বাজেটের মাধ্যমে অনুদান পায়
২৭	Thalassemia Awareness	-	বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বাজেট পায়

	Group		
২৮	ঢাকা ইউনিভার্সিটি ডান্স ক্লাব	মডারেটর: উপাচার্য কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক সভাপতি: শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক: শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে নির্বাচিত	কক্ষ বরাদ্দ আছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বাৎসরিক বাজেটের মাধ্যমে অনুদান পায়
২৯	জাতীয় কবিতা পরিষদ (জাতীয় সংগঠন)	মডারেটর: উপাচার্য কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক সভাপতি: শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক: শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে নির্বাচিত	–
৩০	সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট (জাতীয় সংগঠন)	মডারেটর: উপাচার্য কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক সভাপতি: শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক: শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে নির্বাচিত	–

এসকল সংগঠন ছাড়াও বিভিন্ন আবৃত্তি সংগঠন যেমন– কথা, বৈকুণ্ঠ আবৃত্তি একাডেমি, স্রোত আবৃত্তি একাডেমি, মুক্তবাক্, কজনা, স্বরশ্রুতি, স্বরবৃত্ত, স্বরকল্পন, কণ্ঠশীলন, প্রকাশ সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংসদ, সংবৃতা, অন্যস্বর, স্বরচিত্র, বাক্শীল্পাঙ্গন, কণ্ঠস্বর ইত্যাদি আবৃত্তি সংগঠন তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে। (শরীফ, ২০২১: ৪৮৪)। টিএসসিতে যেসকল নাট্য সংগঠন নিয়মিত মহড়ায় অংশ গ্রহণ করে তা হলো– নাট্যচক্র, পদাতিক, ঢাকা পদাতিক, আরন্যক, ব্যতিক্রম, বহুবচন, সেতুসংলাপ, জনপদ প্রভৃতি (৫৭তম বার্ষিক বিবরণী ১৯৭৯-৮০: ১০)। বাংলাদেশের সঙ্গীত, চলচ্চিত্র, নাট্যাঙ্গনসহ সাংস্কৃতিক অঙ্গনের অনেকের হাতে খড়ি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে। কালের আবর্তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে উঠেছিল সৃজনশীল শিক্ষার উৎসভূমি। অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাকের ভাষায়- পূর্ববাংলার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের শিক্ষা, সাহিত্য-সংস্কৃতি ও জীবনবোধের পরিবেশ সৃষ্টি ও বিবর্তিত হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে (সরদার করিম, ১৯৯৩: ১৩)

বাংলাদেশের অনেক খ্যাতিমান সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব রয়েছেন যাদের অধিকাংশই পরিবেশনা শিল্প সংশ্লিষ্ট বিভাগে পড়াশোনা করেনি। শুধু চর্চা আর এসকল সংগঠনের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাঁরা এসব শিল্প মাধ্যমে পুরোধার আসন লাভ করেছে। এমনইভাবে অনেক প্রথিতযশা সাংবাদিকের হাতি খড়ি হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস সাংবাদিকতার মাধ্যমে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস একজন সাধারণ মানুষকে দক্ষ পেশাদার ব্যক্তি হিসেবে গড়ে তুলেছে, একইভাবে নতুন অনেক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও নেতৃত্ব দিয়েছে। নতুন নতুন ভাবনা শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে আসে এরপর তাঁরা সংগঠন গড়ে তোলেন এবং সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে টিএসসিতে অফিস বরাদ্দের আবেদন করেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সংগঠন পরিচালনার যৌক্তিক

বিবেচনা করলে অনুদান ও জায়গা বরাদ্দের ব্যবস্থা করে। পরবর্তীকালে এসকল সংগঠন অন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তথা জাতীয় পর্যায়ে অনুকরণীয় হয়ে ওঠে।

ঢাবি ক্যাম্পাসে সহশিক্ষা-নির্ভর দৈনন্দিন জীবনচিত্র

ক্লাস, পরীক্ষা, গবেষণাগারের কাজের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও সাংগঠনিক কাজে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস সদা মুখর থাকে। পুরাতন বছরের বিদায় আর নতুন বছরের আগমন উপলক্ষ্যে চলে নানা আয়োজন। বাংলা বর্ষবরণ উৎসবের সর্বজনীনতা সবাইকে ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ করে। এ উপলক্ষ্যে চারুকলা অনুষদ ১৯৮৯ সালে মঙ্গল শোভাযাত্রার সূচনা করে। এই শোভাযাত্রায় মানুষের অংশগ্রহণ দিন দিন বৃদ্ধি পেয়েছে। এই আয়োজন ছাত্র-শিক্ষকদের যৌথ প্রয়াসে অনুষ্ঠিত হয়। মাসব্যাপী চারুকলা অনুষদের শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ধরনের প্রতিকৃতি, মুখোশ এবং আনুষঙ্গিক শিল্পকর্ম বানানোর কর্মযজ্ঞে ব্যস্ত থাকে। এই প্রক্রিয়ায় একদিকে তারা আবহমান বাংলার সংস্কৃতিকে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে পৌঁছে দিচ্ছে, অন্যদিকে তারা হাতে কলমে শিক্ষার একটি সুযোগ পাচ্ছে। মঙ্গল শোভাযাত্রা ২০১৬ সালে ইউনেস্কো কর্তৃক অবস্তুগত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হিসেবে তালিকাভুক্ত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বসন্তবরণ, বর্ষাবরণ, নবান্নউৎসবসহ বিভিন্ন ঋতুভিত্তিক নানা ধরনের উৎসব-আয়োজন দেখা যায়। এসব অনুষ্ঠানাদি শিক্ষার্থীদের মননশীলতা বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ও জাতীয় দিবসের বিভিন্ন কর্মসূচি পালনে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক সাংস্কৃতিক ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ সকল সংগঠন বছরজুড়ে তাদের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়কে উৎসবমুখর করে রাখে। আবাসিক হলেও ছাত্র-ছাত্রীরা ডিবেট, রক্তের গ্রুপ নির্ণয়, রক্তগ্রহীতাদের সহায়তা, মিউজিক ক্লাব, পরিবেশ ক্লাব, সপরিবেশিত মেস ব্যবস্থাপনাসহ নানা কাজে নিজেদের জড়িত রাখে। একই সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগসমূহেও বিভিন্ন ধরনের ক্লাব কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এসব কাজের ভিন্ন ভিন্ন দিক থাকে। একটি দিকে সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে শিখন-প্রশিক্ষণ অন্যদিকে থাকে প্রতিবাদী দিক। শিক্ষার্থীরা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মানবাধিকারের লংঘন, অন্যায়-অবিচার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী সঙ্গীত, পথনাটক, ব্যঙ্গচিত্র ইত্যাদির মাধ্যমে প্রতিবাদী কর্মসূচিতে নেমে পড়ে। এছাড়া জাতীয় দুর্যোগ-দুর্বিপাকে সবার আগে এসব সংগঠন এগিয়ে আসে। এরপর সমাজের অন্য অংশ সেটা অনুসরণ করে। বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত সাইক্লোন, বন্যা, মহামারী, ভবনধ্বস, অগ্নিকাণ্ড ইত্যাদি প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট বিপর্যয়ের সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে উদ্ধার কাজে অংশগ্রহণ করে এবং ত্রাণসামগ্রী সংগ্রহ ও বিতরণ, শুকনো খাবার যেমন রুটি এবং স্যালাইন তৈরি, রক্তদান ইত্যাদি কাজে এগিয়ে যায়। এ ধরনের পরিস্থিতিতে নিয়মিত শিক্ষাকার্যক্রম খানিকটা বিঘ্ন হলেও শিক্ষার্থীরা সেবামূলক কার্যক্রম থেকে দূরে সরে যায়নি। পরবর্তীকালে শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা বাড়তি সময় ও শ্রম দিয়ে শিক্ষার এসব ঘাটতি পুরণ করে নিয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের এ ধরনের চিত্র চিরন্তন।

তবে এটিও সত্য যে, এসব সাংগঠনিক কাজ সিলেবাসভুক্ত শিক্ষা ও গবেষণায় সহায়ক হিসেবে গুরুত্ব বহন করে বটে, তবে মূল শিক্ষাকার্যক্রমকে বাদ দিয়ে এর কোনো প্রাতিষ্ঠানিক মূল্য নেই। মূল একাডেমিক কাজকে অবহেলা করে এবং বিভিন্ন কারণে অনেক মেধাবী শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন বিপন্ন হওয়ার বহু দুষ্টান্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছে। আবার সংস্কৃতিবিমুখতায় অনেকে কূপমণ্ডুকতায় আচ্ছন্ন হয়েছে, কেউ আবার বিপথগামী হয়েছেন সঙ্গদোষে। অনেকে বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনের নীতি ও আদর্শকে বিসর্জন দিয়ে অনাকাঙ্ক্ষিত কাজে জড়িয়ে পথভ্রষ্ট হয়েছেন। প্রাতিষ্ঠানিক বিধিভঙ্গের কারণে অনেক শিক্ষার্থী চিরতরে বহিষ্কৃত হয়েছেন। বর্তমান প্রজন্মের একটি বড় অংশ আধুনিক ভার্চুয়াল

সমাজ মাধ্যমের মোহে আবদ্ধ থাকার কারণে প্রকৃত বিনোদন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। মাঠের খেলাধুলা বাদ দিয়ে এবং টিএসসি বা ক্যাম্পসকেন্দ্রিক নির্মল বিনোদন চর্চাকে অগ্রাহ্য করে ডিজিটাল মাধ্যমের আসক্তির ফলে অন্ধকারের চোরাগলিতে হারিয়ে যাচ্ছেন অনেকে। এভাবে অপমৃত্যু ঘটছে অনেক সম্ভাবনাময় জীবনের।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের কমিউনিটি সার্ভিস: একটি সাম্প্রতিক কেসস্টাডি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার পর থেকেই বিভিন্ন কমিউনিটি সার্ভিস দিয়ে আসছেন। এসকল কর্মসূচির মধ্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণ, পথশিশুদের জন্য স্কুল পরিচালনা, দুর্গতমানুষের স্বাস্থ্যসেবা, খাদ্য বিতরণ, বন্যার্তদের সহায়তা, শীতে কম্বল এবং গরম কাপড় সংগ্রহ ও বিতরণ, কৃষকদের ফসল কাটা, কোভিড-১৯-এর সময় দীর্ঘদিনব্যাপী 'ফ্রি মিল' সার্ভিসের মতো কর্মসূচি অন্যতম। এসকল কার্যক্রমের সামাজিক প্রভাব সূদুরপ্রসারি। তবে নিকট অতীতে ২০২৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা দেশব্যাপী একটি সমাজ সচেতনতামূলক কর্মসূচি পরিচালনা করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে অ্যাসোসিয়েশনের বৃত্তিপ্রাপ্ত ৬৭৭ জন ছাত্র-ছাত্রী 'সমাজ পরিবর্তনে শিক্ষার্থী' শ্লোগানে দেশব্যাপী একটি সচেতনতামূলক কর্মসূচি পরিচালনা করে। ২০২৩ সালের ১০ অক্টোবর এই কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয় এবং ১১ই অক্টোবর থেকে ৩০ শে অক্টোবর পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা ১০১টি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে দেশের ৬৪টি জেলার প্রায় সবগুলো উপজেলার ৫০০ টি স্থানে এই 'ক্যাম্পেনটি' পরিচালনা করেন। বিশেষ করে বিভিন্ন স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, উঠোন সভা, মসজিদ, মন্দির ও অন্যান্য উপাসনালয়ে এই কর্মসূচি পরিচালিত হয় (চ্যানেল ৭১, ১ নভেম্বর, ২০২৩)।

সমাজ পরিবর্তনে শিক্ষার্থী কর্মসূচির দুটি স্থিরচিত্র (ছবি: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সংগ্রহ থেকে)

মূলত মাদক, বাল্যবিবাহ, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের ন্যায় সামাজিকব্যাধি থেকে যুব বয়সের ছেলে-মেয়েদের মুক্ত রাখার লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা সচেতনতামূলক ও অনুপ্রেরণাদায়ক এই প্রচারাভিযান পরিচালনা করেছিলেন। শুধু যুবক-যুবতীদেরকেই নয়– স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসার শিক্ষক, এনজিও কর্মী, মসজিদের ইমাম, মন্দিরের পুরোহিত, গ্রামপ্রধান এবং বিভিন্ন পর্যায়ের মহিলাদের সাথেও তারা উঠোন বৈঠকের মাধ্যমে মতবিনিময় করেন। এই কর্মসূচি বাস্তবায়নে জেলা প্রশাসন, উপজেলা প্রশাসন, ইউনিয়ন পরিষদ এবং গ্রামের প্রধান ব্যক্তিরা সহযোগিতা করেন। শিক্ষার্থীরা ফিরে এসে তাদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছিলেন। ছাত্র-ছাত্রীরা মাঠপর্যায়ের এই কর্মসূচির মাধ্যমে বেশ কিছু বাল্যবিবহ রোধ, সামাজিক বিরোধ নিষ্পত্তিসহ গ্রামের শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটি সুন্দর স্বপ্নের বীজ বপন করে আসতে পেরেছিলেন বলে তারা জানান। বিশেষ করে এর মাধ্যমে

শিক্ষাজীবন শেষে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে কিভাবে নেতৃত্ব প্রদান করবেন তার একটি হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ এর মাধ্যমে পেয়েছেন বলে তারা যানান। এ ধরনের কর্মসূচির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা একদিকে দেশ ও সমাজের প্রতি তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ সম্পর্কে সচেতন হয়, অন্যদিকে তাদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলি বিকশিত হয়।

উপসংহার

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচনালগ্ন থেকেই শ্রেণিশিক্ষার পাশাপাশি সহশিক্ষামূলক কার্যক্রম এর শিক্ষার্থীদের জীবনমান গঠনে গভীর প্রভাব রেখেছে। এ বিদ্যাপিঠের শ্রেণিশিক্ষা শিক্ষার্থীদের অ-শিক্ষার অন্ধকার থেকে জ্ঞানের আলোর সন্ধান দিয়েছে। আর এর সহশিক্ষামূলক বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক ও সেবামূলক কর্মকাণ্ড তাঁর শরীর, মন ও চরিত্র গঠনে ভূমিকা রেখেছে। এই সম্মিলিত শিক্ষাপদ্ধতি তাঁর শিক্ষার্থীকে অসাম্প্রদায়িক মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন দক্ষ মানব সম্পদে রূপান্তর করেছে। আর এর ফলাফল হলো, শুধু সার্টিফিকেট সর্বস্ব একজন গ্র্যাজুয়েট নয়- মন শরীর ও চরিত্রের পূর্ণাঙ্গ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সত্যিকারে শিক্ষিত একজন মানুষ।

এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতি এ জনপদের মানুষকে সার্বিক মুক্তির পথ দেখিয়েছে– এই মুক্তি অশিক্ষার অন্ধকার থেকে মুক্তি তথা অধিকারহীনতা, কুসংস্কার থেকে মুক্তি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকালে এদেশের অধিকাংশ মানুষ গ্রামে বাস করতেন যারা নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না। এই পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর অধিকারসচেতন নাগরিকে রূপান্তর করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল এ বিশ্ববিদ্যালয়। রাজনৈতিক অধিকারহীনতা, শোষণ-বঞ্চনা, দুর্যোগ-দুর্ঘটনা কিংবা মানবিক প্রয়োজনে করণীয় নির্ধারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা কখনো দ্বিধান্বিত ছিল না। সময়ের সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের শিক্ষা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ থেকে তারা পায় সহজাত শিক্ষার মতোই। এখানকার সিলেবাসভুক্ত শিক্ষার সাথে সহশিক্ষার সমন্বয় প্রত্যুৎপন্নমতিসম্পন্ন মানুষ গঠনে সহায়ক ভূমিকা রাখছে। এ জনপদের অধিবাসীদের যা কিছু অর্জন তাঁর বহুলাংশ জুড়ে রয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান। বাঙালির সবচেয়ে বড় অর্জন মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে একটি জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা; আর স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যূদয় এবং তার অগ্রগতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। বহু মত-পথের এই জাতিকে জাতীয়তাবাদী চেতনায় রূপান্তর করেছিল এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতি। এখানকার এই যৌথ জীবনব্যবস্থা তথা সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও সাংগঠনিক কাজ তাঁদেরকে ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ করেছিল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন যে সকল শিক্ষার্থী জাতীয় তথা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সুখ্যাতি অর্জন করেছেন তাঁরা কোনো না কোনোভাবে ক্লাসরুম শিক্ষার পাশাপাশি পাঠ্যক্রম বহির্ভূত সহশিক্ষমূলক বিভিন্ন কার্যক্রমের সাথে যুক্ত ছিলেন, তা প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের স্মৃতিকথা, জীবনী তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন নথিপত্র থেকে জানা যায়। এসকল কাজকে সময়ের অপচয় হিসেবে যারা দেখেছেন তাদের কর্মজীবনে নানা ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়েছে।

পরিশেষে এ কথা বলা যায় যে, শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিজীবন তথা সামগ্রিকভাবে সমাজজীবনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতির সুদূরপ্রসারী প্রভাব রয়েছে। তবে এখানে প্রচলিত শারীরিক শিক্ষার বাধ্যবাধকতা উঠে যাওয়ার ফলে বর্তমানকালের শিক্ষার্থীরা অনেক ক্ষেত্রে শরীরচর্চার প্রতি অনাগ্রহী হয়ে পড়ছে। ভার্চুয়াল গণমাধ্যমে বিচরণের ফলে অনেকে বাস্তবতা বিবর্জিত চিন্তাদর্শনে গা ভাসিয়েছেন। এর ফলে অনেকে পাঠ্যবহির্ভূত চর্চা থেকে সরে যাচ্ছেন। খেলার মাঠ, জিমনেসিয়াম,

টিএসসির সামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, বকুলতলার পরিবেশনা শিল্প, মধুর কেন্টিনের রাজনৈতিক সহাবস্থানের চর্চা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার বহুত্ববাদী সংস্কৃতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামের ভর্তির পর প্রত্যেক শিক্ষার্থী অন্তত একটি সহশিক্ষামূলক কাজে যুক্ত হতে পারে সে বিষয়টি গুরুত্বসহকারে ভাবা যেতে পারে।

টীকা

---

[১] এসব ক্লাব ও সোসাইটির মধ্যে কয়েকটির নাম উল্লেখ করা হলো– Aerospace and Rocketry, Behavioural insights Group, Bioengineering Society, Dance Society, Diplomatic Society, Future Education development associets, Gamimg and Espotrs Society, Horror Society, Music Society, Nature Conservation Society, Refugee Health Initiative, Scout and Guide Group, Space and Astronomy Society, Wind Orchestra etc (Ox.ac.uk/students/life/clubs).

[২] An exemption might be granted to students who take an active part in game and are certified as being physically fit, see- *Cacutta University Commission, 1917-19*, Report, Volume IV, Part-II, Superintendent Government Printing, India, P. 226

[৩] কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়েছে, a true education can be obtained- the training of mind, body and character; the result 'not a book but a man'. See, - *Cacutta University Commission, 1917-19,* Report, Volume IV, Part-II, Superintendent Government Printing, India, P. 141,

[৪] Indian Statutory Commission, Interim Report of the Indian Statutory Commission (Review of growth of Education in British India by the Auxiliary Committee appointed by the Commission, September 1929, P. 142

[৫] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস চ্যান্সেলর স্যার পি জে হার্টগ মুসলিম হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক এ এফ রহমানকে অনুরোধ করলে তিনি ১৯২১ সালের সালের সেপ্টেম্বর মাসে মুসলিম হলে সর্বপ্রথম ছাত্র সংসদ প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর অন্য দুটি হলেও ছাত্রসংসদ গঠিত হয়। ১৯২২-২৩ সালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদনে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়। ১৯২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে Dhaka university students' union (DASU) গঠিত হয়। ১৯৫৩ সালে নাম পরিবর্তন করে Dhaka university Central students' union (DUCSU) রাখা হয়। দেখুন– রংগলাল সেন, 'জগন্নাথ হলের ইতিহাস ও প্রয়াত প্রাধ্যক্ষ প্রসঙ্গ', *বাসন্তিকা*, হীরক জয়ন্তী সংখ্যা, (১৯২১-১৯৮১), জগন্নাথ হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮১, পৃ.১৮, ডাকসু সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন- *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০২১, পৃ.পৃ. ৫১০-৫২৪

[৬] কমিটির রিপোর্টে বলা হয়, 'In every hall there should be a library providing both books for pure recreation and others, supplementing the university library, and touching intellectual interests out the formal curriculum. Again, there should be societies not only for athletics and games but for the discussion of topics of learned and every-day interest. See, *Cacutta University Commission, 1917-19*, Report, Volume IV, Part-II, Superintendent Government Printing, India, P. 148

[৭] বিস্তারিত দেখুন- *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১০২তম বার্ষিক বিবরণী* ২০২২-২০২৩, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা অক্টোবল, ২০২৩, পৃ.পৃ.৯৭০-৯৮৫

[৮] বাংলাদেশ ন্যাশনাল কোর ব্রিটিশ শাসনামলে ১৯২৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যায়ে ইউনির্ভার্সিটি ট্রেনিং কোর (ইউটিসি) নামে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৩ এর নাম পরিবর্তন করে ইউনিভার্সিটি অফিসার্স ট্রেনিং কোর (ইউওটিসি) রাখা হয়। ২৩ মার্চ ১৯৭৯ সালে ইউওটিসি, বাংলাদেশ ক্যাডেট কোর, এবং জুনিয়র ক্যাডেট কোর একত্রিত করে বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর গঠিত হয়। বর্তমানে আর্মি, নৌ এবং বিমান এই তিনটি শাখায় বিএনসিসি'র কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ৭৫০ শিক্ষার্থী বিএনসিসি'র ক্যাডেট হিসেবে কর্মরত আছেন। বিএনসিসি'র মূল মন্ত্রঃ Grooming Future Leaders (তথ্যসূত্রঃ *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০২তম বার্ষিক বিবরণী*, ২০২২-২০২৩, রেজিস্ট্রার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, অক্টোবর, ২০২৩, পৃ. ৯৮৯, সৈয়দ আবুল মকসুদ, (২০২০) *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা*, ঢাকা, প্রথমা, পৃ. ৩৫২, বিএনসিসি ওয়েবসাইট@: http/bncc.info)

[৯] রোভার স্কাউট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৬০ এর দশকে প্রতিষ্ঠিত হলে ১৯৬৫-৬৬ সেশনে প্রথম দীক্ষা প্রদানের মাধ্য কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়। সত্তরের দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্রালয় স্কাউট গ্রুপ মানিকগঞ্জের দশচিড়া গ্রামে একটি সমাজ উন্নয়নমূলক কাজ শুরু করে। কয়েক দশ ধরে ঢাকা বিশ্ববিদ্রালয়ের স্কাউট গ্রুপ ক্যাম্পাস ও ক্যাম্পসের বাইরে ভিটামিন্ ও ক্যাম্পেইন, বৃক্ষরোপণ, ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ, শৃঙ্খলা রক্ষাসহ বিভিন্ন সেবামূলক কাজ করে যাচ্ছেন। (তথ্যসূত্রঃ *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯৯তম বার্ষিক বিবরণী, ২০১-২০২০*, রেজিস্ট্রার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জুন, ২০২১, পৃ. ৯৬২)

[১০] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রেঞ্জার ইউনিট প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭৩ সালে। পাঁচটি ছাত্রী হলের সমন্বয়ে ঢাবি রেঞ্জার ইউনিট গঠিত। রেঞ্জারদের মূলনীতি হলো– মানবতা, সেবা, সমাজ সচেতনতা, কর্তৃব্য নিষ্ঠ হওয়া, সদা জাগ্রত মানসিক প্রস্তুতি ইত্যাদি রেঞ্জাররা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গাইড ক্যাম্প, সেমিনার ও গাইড অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সুযোগ পায় (তথ্যসূত্রঃ *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯৯তম বার্ষিক বিবরণী, ২০২১-২০২০*, রেজিস্ট্রার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জুন, ২০২১, পৃ. ৯৬০)

[১১] ২০২২ সালে বাঁধনের রজতজয়ন্তী উপলক্ষ্যে এই তথ্য প্রকাশ করা হয়। ২০২২ সালের পর এই সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে।

[১২] টিএসসির সুইমিংপুলটি আশির দশক পর্যন্ত চালু ছিল। এখানে শিক্ষার্থীরা নিয়মিত সাঁতার প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও চর্চা করতেন (*ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৫৯তম বার্ষিক বিবরণী ১৯৭৯-৮০*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা জুন, ১৯৮১, পৃ. ৯) ১৯৮৪-৮৫ সালে প্রকাশিত ৬৪তম বার্ষিক বিবরণীতে উল্লেখ করা হয় যে, গভীর নলকূপটি নষ্ট থাকায় সুইমিংপুলটি নিয়মিতভাবে চালু রাখা সম্ভব হয় নাই।

[১৩] উল্লেখিত সংগঠনসমূহের অধিকাংশকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্যিক বাজেটের অর্থনৈতিক কোড-৩২২১১০৯-এর বিভিন্ন উপখাত থেকে আর্থিক বরাদ্দ প্রদান করা হয়। অনেক সংগঠনকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিভিন্নভাবে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করা হয়। সূত্রঃ টিএসসি দপ্তর (অপ্রকাশিত ডকুমেনটস্) এবং *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন বাজেট* (২০১৯-২০২০ অর্থবছরের সংশোধিত এবং ২০২০-২০২১ অর্থবছরের মূল বরাদ্দ) প্রকাশক, কোষাধ্যক্ষ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জুন ২০২০, পৃ. ১১৬-১১৯

উল্লেখপঞ্জি

M. A. Rahim (1981). The University of Dhaka, Dhaka.

রংগলাল সেন (২০০৩)। বাংলাদেশ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, শিখা প্রকাশনী, ঢাকা।

Professor Promathnath Banerjee, et. al (Ed.) (1957). *Hundred years of the University of Calcutta: A History of the University Issued in Commemoration of the Centenary Celebrations*, Calcutta, Sree Saraswaty Press Ltd.

Cacutta University Commission 1917-19, Report, Volume IV, Part-II, Superintendent Government Printing, India.

The Calendar (1953) Vol. 1, Parts I. II, III & IV, Published by The Dhaka University, Dhaka.

মুহম্মম জাহাঙ্গীর আলম সম্পা. (১৯৯২)। *স্মৃতি কথায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*, মাওলা ব্রাদার্স ঢাকা।

সৈয়দ আবুল মকসুদ (২০২০)। *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা*, প্রথমা, ঢাকা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন বাজেট, ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের সংশোধিত এবং ২০২০-২০২১ অর্থবছরের মূল বরাদ্দ (জুন ২০২০)। প্রকাশক, কোষাধ্যক্ষ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Office of the Dacca University, *ফাইল-২*, রেজি: অফিস ১৯৪৪-৪৭

বিশ্বজিৎ ঘোষ, সম্পা. (২০২১)। *শতবর্ষের আলোয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯৯তম বার্ষিক বিবরণী (২০২১)। ২০১৯-২০২০, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

বাঁধন, রজতজয়ন্তী সংখ্যা ২৪ অক্টোবর, ২০২২

বাঁধনের বার্ষিক সাধারণ সভা ও দায়িত্ব হস্তান্তর-২০২৪, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

শরীফ উদ্দিন আহমেদ, *সম্পা.* (২০২১)। *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস ও ঐতিহ্য* (সম্পা.) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

*ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০২তম বার্ষিক বিবরণী (*২০২৩) ২০২২-২০২৩, রেজিস্ট্রার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

*ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯৯তম বার্ষিক বিবরণী (*২০২১), *২০২১-২০২০*, রেজিস্ট্রার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৫৯তম বার্ষিক বিবরণী, (১৯৮১), ১৯৭৯-৮০, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৬৪তম বার্ষিক বিবরণী (১৯৮৬) ১৯৮৪-৮৫, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

The Dacca University Brochure (968), *a review of changes and developments during the decade 1958-68*, published1

সরদার ফজলুল করিম (১৯৯৩)। *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও পূর্ববঙ্গীয় সমাজ: অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক-এর আলাপচারিতা*, সাহিত্য প্রকাশ ঢাকা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শারীরিক শিক্ষাকেন্দ্র (২০২৫) ১৯৫৮ থেকে ২০১১ সন পর্যন্ত 'ব্লু' প্রাপ্তদের তালিকা (অপ্রকাশিত প্রাতিষ্ঠানিক নথি) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Indian Statutory Commission (1929). Interim Report of the Indian Statutory Commission (Review of growth of Education in British India by the Auxiliary Committee appointed by the Commission চ্যানেল ৭১ (১ নভেম্বর, ২০২৩)। সমাজ পরিবর্তনে শিক্ষার্থী: ঢাবি শিক্ষার্থীদের পরিচালিত দেশব্যাপী সচেতনতামূলক কর্মসূচি [টেলিভিশন সম্প্রচার]।